সাইফুল ইসলাম

মসলিনের খোঁজে

মসলিনের অনেক রকম কিংবদন্তি শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি। 'মসলিন শাড়ি এত সূক্ষ্ম যে দেশলাইয়ের বাক্সে এঁটে যায়', 'আংটির ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে'। আর শুনেছি, 'ব্রিটিশরা মসলিন কারিগরদের আঙুল কেটে দিয়েছিল', তাই এটা হারিয়ে গেছে, এখন আর নেই।

আহসান মঞ্জিলের মসলিন নাইট, 'নতুন মসলিন' পরা দুই মডেল ইশা ও পিয়া। ছবি : দৃক

সেসব শুনে খুব আফসোস হতো। এমন একটি ঐতিহ্য আমরা হারিয়ে ফেললাম! একপর্যায়ে মনে এই প্রশ্নও জাগল, এই কিংবদন্তির মসলিন কি আসলেই ছিল? তবে কোনো দিনও ভাবিনি, মসলিন আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমি যুক্ত হব। যখন সুযোগ হলো, তখন একান্তভাবে এই কাজে সম্পৃক্ত হলাম।

'মনে হয়, একটা মাকড়সার জাল...এতই সূক্ষ্ম যে হাতে ধরলে প্রায় বোঝা যায় না, কী ধরেছি হাতে।'

—জন-ব্যাপতিস্ত তাভের্নিয়ে

সপ্তদশ শতকের ফরাসি রত্ন ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক, ১৬০৫-১৬৮৯

শুরুর কথা

২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শরিফুদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্রিকলেন সার্কেল আয়োজিত একটি সেমিনারে বক্তব্য দেন। হোয়াইট চ্যাপেলে আয়োজিত সেমিনারটির বিষয় ছিল 'মসলিন : দ্য ফেমাস টেক্সটাইলস অব বেঙ্গল'। সেই সেমিনারে অংশ নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্টেপনি কমিউনিটি ট্রাস্ট। স্টেপনি ট্রাস্ট লন্ডনের বাঙালিদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত। মসলিনের ব্যাপারে জানতে পেরে তারা উৎসাহী হয়। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে স্টেপনি ট্রাস্ট লন্ডনে একটি এক্সিবিশন করে। 'বেঙ্গল টু ব্রিটেন' ছিল প্রদর্শনীর নাম। বাংলার মসলিন কীভাবে ব্রিটেনে পৌঁছাল সে কথা এবং মসলিনের সৌন্দর্য ও মিথগুলো সেখানে তারা তুলে ধরেছিল।

২০১৩-এর নভেম্বরে স্টেপনি

চিত্রে আদি ফুটি কার্পাসগাছ

নবাব টিপু সুলতানের ব্যবহৃত মসলিন

ট্রাস্টের সঙ্গে আমার দেখা হলো। দৃকের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে তারা প্রস্তাব দেয়, দৃক যেন তাদের প্রদর্শনীটি বাংলাদেশে নিয়ে যায়। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, মসলিনের ব্যাপারে তাদের কাছে কী কী তথ্য আছে? প্রদর্শনী উপলক্ষে ছাপানো একটি বই তারা আমাকে দেয়। বইটি পড়ে মসলিনের ব্যাপারে অনেক কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে অনেক রকম প্রশ্নও জাগল। বইয়ে মসলিনের মিথ, এর সৌন্দর্যের দিকটি ছিল। কিন্তু মসলিন কীভাবে তৈরি হতো, কারা বানাত, কীভাবে এই শিল্প শেষ হয়ে গেল, আর বর্তমানে এর অবস্থাই বা কী—এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা হলো না। আমি ভাবলাম, শুধু মসলিনের সৌন্দর্য না, এর পেছনের অন্য গল্পগুলোও তো জানা দরকার। জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে তাদের

এখনকার ফুটি কার্পাসগাছ

কাছে আর কোনো তথ্য আছে কি না? তারা জানাল, এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া কঠিন। প্রদর্শনীতে যে কাপড়গুলো তারা দেখিয়েছিল, সেগুলো মসলিন নয়। এখনকার তাঁতিদের তৈরি থান কাপড়ের ওপর ব্যবহার করা মসলিনের নকশা ওগুলো। নকশাগুলো তারা পেয়েছে যুক্তরাজ্যের কয়েকটি জাদুঘর থেকে, যেখানে মসলিনের কাপড় সংরক্ষিত আছে।

আমার মনে হলো, মসলিনের ঐতিহ্যের ব্যাপারে আরও বিশদভাবে জানার প্রয়োজন আছে। স্টেপনি ট্রাস্টকে বললাম, দৃক যদি এটা এভাবেই বাংলাদেশে নিয়ে যায়, তাহলে অনেক প্রশ্ন উঠবে। যুক্তরাজ্যে কেউ হয়তো প্রশ্ন করেনি, কিন্তু বাংলাদেশে করবে। প্রশ্ন উঠবে, মসলিন নিয়ে প্রচলিত গল্পটির আরও যে দিকগুলো আছে, সেগুলো কোথায়? মসলিন নিয়ে বাংলাদেশের গল্পটা যেন আমরা বলতে পারি, সে জন্য আরও তথ্য দরকার। বাংলাদেশে এসে আমি দৃকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলাম। সবাই খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁরা আরও বললেন, এর আগে দৃক ছবি (আলোকচিত্র) নিয়েই বিশেষত কাজ করেছে। তাই এই ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

২০১৪-এর এপ্রিল মাস থেকে আমরা মসলিন নিয়ে গবেষণা শুরু করি। প্রথমেই চার-পাঁচজনের একটি ছোট দল গঠন করি। তারপর সবাই মিলে উপস্থিত তথ্যগুলো এক জায়গায় এনে কাজ ভাগ করে নিই। এই সাংগঠনিক কাজ করে আমরা চলে যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। সেখানকার তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শরিফুদ্দিন বললেন, যে প্রশ্নগুলো আমি করছি, সে ব্যাপারে আমার আরও অনেক পড়াশোনা করা উচিত। কিছু বইয়ের খোঁজ তিনি দিলেন। সংগ্রহ করে দিলেন জেমস টেলরের একটি বই *অ্যা স্কেচ অব দা টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা* (১৮৪০)। তাঁর কথাতেই এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমিতে গেলাম। বাংলা একাডেমিতে গিয়ে দেখি, তারা জামদানির ওপর অনেক গবেষণা করছে। বাংলাদেশ ক্রাফটস কাউন্সিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. ইফতেখার ইকবালের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছে। সেখানে

বোনা হচ্ছে 'নতুন মসলিন'

জামদানি ও মসলিন সম্পর্কে সুন্দরভাবে অনেক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় সহায়তা করেছে।

তখন ক্র্যাফটস কাউন্সিলের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। প্রথমে কথা বলি ড. হামিদা হোসেনের সঙ্গে। হামিদা আপার বই *দ্য কোম্পানি উইভারস অব বেঙ্গল ১৭৫০-১৮১৩* (তাঁর পিএইচডি থিসিসের অংশ) আমাকে ২০০ বছর আগের তাঁতের জগৎ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেয়। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল করিমের বই *ঢাকাই মসলিন* পড়ে দেখলাম। বইটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। মসলিনের ওপর এত তথ্য আছে, এটা আমার জানা ছিল না। আর কী কী তথ্য থাকতে পারে—এখন সেটি আমাকে খুঁজে দেখতে হবে। ক্র্যাফটস কাউন্সিলের রুবি গজনবী জামদানি ও নীল চাষ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। চন্দ্র শেখর সাহা বুনন নিয়ে মাঠে কাজ করছিলেন। টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির স্থাপন করেছেন মুনিরা ইমদাদ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, বাংলাদেশে মসলিন সম্পর্কে কতটুকু তথ্য আছে, তার একটা ধারণা পেলাম। তারপর যাই জাতীয় জাদুঘরের লাইব্রেরিতে। সেখানে রাখা দুটি মসলিনের কাপড় দেখার সুযোগ হলো। কথা বললাম সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। খোঁজ করি ইউনেসকোতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি বিভাগে।

সবার সঙ্গে কথা বলে, বই পড়ে দেখলাম, মসলিনের তুলা ছিল অন্য তুলা থেকে ভিন্ন। সেই তুলাগাছ আবার কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় জন্মাত। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে গেলাম। কিন্তু ২৪০ বছরে বাংলাদেশের নদীর গতিপথ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে, তাই বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং অর্গানাইজেশন (স্পারসো), যেখানে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট ম্যাপিং হয়, সেখানেও গেলাম। পুরোনো মানচিত্রগুলো সংগ্রহ করলাম। ইতিহাসের পুরোনো বই ঘাঁটতে হলো।

'সিনেরগাঁও একটা শহর, সেরীপুর থেকে ছয় লীগ দূরে, যেখানে সমগ্র ভারতের সেরা এবং সূক্ষ্মতম কাপড় পাওয়া যায়।'

—র‍্যালফ ফিচ
ইংরেজ ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক
১৫৫০-১৬১১

মলমলের তুলার সন্ধানে

মসলিনের প্রাচীন নাম মলমল। আমরা এত দিনে যে তথ্য জোগাড় করেছি বিভিন্ন উৎস থেকে, তাতে বুঝতে পারলাম, যে তুলায় মসলিন হয়, সেই তুলার গাছ এখন আর নেই। কিন্তু চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশে সেই নদী তো আছে। বাংলার সেই মাটিও আছে, তাই ২০১৪-এর মে মাসের দিকে আমরা নৌকা নিয়ে গাজীপুরের কাপাসিয়ার থেকে রওনা দিলাম। নদীর ধারে গ্রামগুলোতে থেমে থেমে সেখানকার লোকজনকে ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই গাছ দেখেছে নাকি, মসলিন সম্পর্কে কিছু শুনেছে নাকি, কিছু মনে আছে নাকি। এই করতে করতে আমরা ময়মনসিংহ পর্যন্ত চলে গেলাম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে তাঁরা যেসব তুলা নিয়ে কাজ করছেন, সেগুলোর নমুনা জোগাড় করলাম। পরের মাসে একইভাবে ঢাকা থেকে বরিশাল পর্যন্ত নৌপথে যেতে হলো। এই পুরো ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথে যেখানেই দেখেছি একটু ভিন্ন তুলার গাছ আছে, সেগুলোর নমুনা সংগ্রহ করেছি।

ঢাকায় ফিরে এসে আমরা তাঁতের কাপড়ের বুননের সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বললাম। বিবি রাসেলের বিবি প্রডাকশনস, প্রবর্তনা, সাপুরা, আড়ং—এদের সঙ্গেও আলাপ শুরু হলো। তাদের কাছে কী তথ্য আছে, সেটা জানতে চাইলাম। বেশির ভাগ তথ্য জামদানির বিষয়ে পাওয়া গেল। এরপর আমরা জামদানির যেসব কারিগর আছেন, তাঁদের কাছে গেলাম। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), তাঁত বোর্ড, জামদানিপল্লির অনেক তাঁতির কাছে গেলাম। তাঁতিদের পেছনের ইতিহাস, আগের বংশে কেউ মসলিন বুনেছেন কি না, মসলিন সম্পর্কে কতটুকু তাঁরা জানেন—এসব নিয়ে খোঁজখবর চলতে থাকল।

এরপর ২০১৪-এর মেতে তুলাগাছের খোঁজে আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে পুরস্কার ঘোষণা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে যোগাযোগ করি। কারণ, ছাত্ররা ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে বিভিন্ন গাছের খোঁজ করে থাকে।

এর ফলে আমরা নানা ধরনের তুলার চারা পেলাম। তবে সেগুলো সঠিক গাছ কি না, বুঝতে পারছিলাম না। তখন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সেই চারা তাদের দিলাম। অনেক আগ্রহ প্রকাশ করল তারা এবং বোর্ডের পাইলট ফার্ম রংপুর ও গাজীপুরে চারাগুলো লাগাল। একই সঙ্গে কিছু চারা দুকের উদ্যোগে লাগানোর ব্যবস্থা হলো। ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আমাদের এই কার্যক্রম সম্পর্কে খুলে বললাম।

বাংলাদেশে গবেষণার কাজ অক্টোবর মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে

যায়। এত দিনের গবেষণা থেকে বুঝতে পারলাম, বাংলাদেশের তাঁতিরা বাজারের প্রবল চাপের মধ্যে আছেন। তাঁরা এখন যে জামদানি বুনছেন, যদিও সেটি বিলুপ্ত মসলিনেরই একটি ধারা, কিন্তু তা তৈরি হচ্ছে অনেক মোটা সুতা দিয়ে। এই জামদানি প্রাচীনকালের নকশা ও সূক্ষ্মতা সংরক্ষণ করছে না। মসলিন নিয়ে দেশে যে তথ্যগুলো আছে, তার ভেতরেও বেশ কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা আছে, আর প্রকাশিত তথ্যে বাংলাদেশের উল্লেখ ন্যূনতম।

'একটা সময় ছিল ঢাকার সাতগাঁও এলাকা থেকে রপ্তানি করা মসলিন কাপড় পরতেন রোমান নারীরা, তখন বাংলার মসলা ও অন্যান্য জিনিসও মিসর হয়ে রোমে পৌঁছাত। এসব বস্ত্র অত্যন্ত সমাদৃত ছিল এবং প্রচুর দামে বিক্রি হতো।'

—জোয়াকিম জোসেফ আ ক্যাস্পোস
হিস্ট্রি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল
১৮৯৩-১৯৪৫

মসলিনের গল্পে বাংলাদেশ নেই!

আমি আবার বিলেতে চলে এলাম। এখানকার কিউ গার্ডেনে যে

এখনকার পোশাকে আদি মসলিনের অনুপ্রাণিত নকশা। মডেল : জুঁই

নমুনাগুলো আছে, সেগুলো দেখার চেষ্টা করলাম আবার। তার জন্য গবেষক হিসেবে কিউ গার্ডেনে আবেদন করতে হলো। অনুমতিও মিলল। ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম—সেখানে বসে বসে তাদের কাছে যেসব পুরোনো বই আছে, সেগুলো পড়া শুরু করলাম। স্টেপনি ট্রাস্টের সঙ্গে মসলিনের প্রদর্শনীর জন্য কাজ করেছিলেন 'ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট' জাদুঘরের সোনিয়া অ্যাশমোর, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মসলিনের ওপর তাঁর একটি বই আছে। এখানে আরও যেসব জাদুঘর আছে—ব্রাইটন মিউজিয়াম, ন্যাশনাল হেরিটেজ মিউজিয়াম, বাথ মিউজিয়াম, পাউইসকাসল, জেন অস্টিন মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম—চার-পাঁচ মাস ধরে সবগুলোই দেখি আমি।

এই পর্যায়ে প্রচুর তথ্য পেয়েছি। সেগুলো সাজানোও আছে। এই তথ্যগুলো থেকে যে গল্প পাওয়া গেল, সেটা লেখা হয়েছে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলাদেশের কোনো গল্প সেখানে নেই। কেউ সেখানে আমাদের গল্প তুলে ধরেনি। কিন্তু তাদের গল্পটা চ্যালেঞ্জ করা দরকার। বলা দরকার, এ গাছ, এ কাপড় আমাদের ছিল। ব্রিটিশরা অন্য জায়গায় গাছ লাগিয়ে

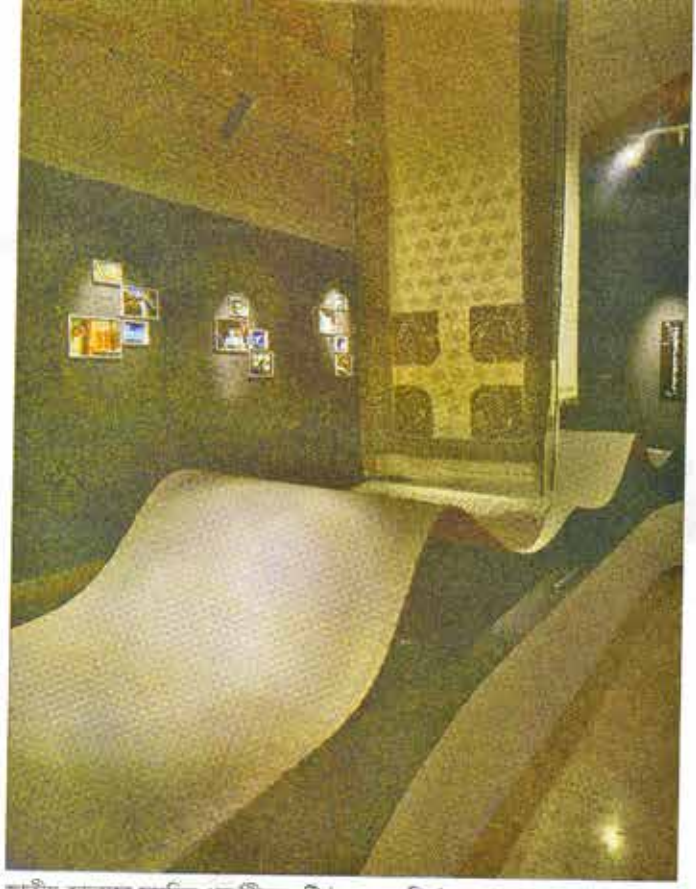

জাতীয় জাদুঘরে মসলিন প্রদর্শনীতে দুটি 'নতুন মসলিন'

চেষ্টা করেছিল মসলিন তৈরি করতে, কিন্তু পারেনি। মসলিনের মতো সূক্ষ্ম কাপড় ভারতের অল্প কিছু জায়গায়ও হতো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো যেটা, যার সুনাম চীন, পারস্য, তুরস্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটা ছিল আমাদের মসলিন, ঢাকায় তৈরি মসলিন।

ভারতে অনেক তাঁত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য দর্শন শাহ (উইভার্স স্টুডিও), রুবী পাল চৌধুরী (আর্টিসানা), জাসলিন ধামিজ (কারু ইতিহাসবিদ) ও মায়াঙ্ক কাউল (কারু গবেষক)।

গল্পটা পাল্টাতে হলে তাদের তথ্য জেনে আমাদের তথ্যগুলোকে প্রমাণসহ পুনঃস্থাপিত করতে হবে। একই সঙ্গে দেখাতে হবে যে মসলিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে ঠিকই, তবে আমাদের কারিগরদের যে দক্ষতা ছিল, সেটা এখনো আছে। তাহলে এটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল দুদিক থেকে। একদিকে তত্ত্বীয় জ্ঞানগুলোকে এক জায়গায় করা। অন্যদিকে তাঁতিদের সঙ্গে কাজ করে সূক্ষ্ম সুতা বুননের সামগ্রিক ব্যবস্থার আয়োজন করা।

মসলিনের বুনন এতই মিহি, মনে হয় যেন কুয়াশা

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে আমি দেশে ফিরে আসি। ঠিক করি, দুদিক থেকেই এবার এগোব। একদিকে দেশের তাঁতিদের গল্পটা বুঝিয়ে বলা, অন্যদিকে নতুন করে মসলিন তৈরির চেষ্টা—দুটোই করব আমরা।

এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। ফ্রান্সে একধরনের তথ্য পাওয়া গেল। ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, তুরস্কেও মসলিনের তথ্য আছে। ভাবিনি, সুইজারল্যান্ডে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু পাওয়া গেল। তা ছাড়া ভারত, যুক্তরাজ্য তো আছেই। মসলিন কত দূর ছড়িয়েছিল এবং কত ধরনের নকল তৈরি করা হয়েছিল—এসব দেশে গিয়ে জানতে পারলাম। মানুষ কতভাবে এর সম্পর্কে লিখেছে, এটাকে ব্যবহার করেছে, এ নিয়ে কত ব্যবসা হয়েছে! একসময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ৭৫ ভাগ মুনাফা এসেছে কেবল মসলিন থেকেই। আবার এই কাপড়ের আদান-প্রদানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে কত—গল্পের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে সেগুলো বলা হয়েছে। বুঝতে পারলাম, এটা শুধু বাংলাদেশ আর ব্রিটেনের গল্প না, এটা বিশ্বের গল্প।

ভারতকে তখন বিশেষভাবে জানাবোঝার দরকার হলো। কারণ, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে তাঁতি ও সুতা কাটুনিরা ভারতে চলে গেছে। আমি মুর্শিদাবাদ, কালনা, ফুলিয়া, কলকাতা, দিল্লি, জয়পুর—বিভিন্ন জায়গায় গেলাম। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। কলকাতার আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনে যেসব প্রাচীন তুলাগাছের নমুনা ছিল, সেগুলো দেখলাম। সেখানে কিছু পেইন্টিং আছে, সেগুলো দেখলাম। আর পেলাম জন ফোর্বস ওয়াটসনের একটা বই *দ্য টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ইন্ডিয়া*, যেখানে মসলিনের অনেকগুলো নমুনার কথা আছে। মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাড়িতে প্রথম মসলিনের সূক্ষ্ম কাপড় দেখি। আংটির ভেতর দিয়ে সে মসলিন চলে যায়! তারপর দিল্লিতে ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্র্যাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুম মিউজিয়ামে মসলিনের পুরো সংগ্রহটি কয়েক দিন ধরে দেখলাম। কলকাতা আর জয়পুরে মসলিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ আছে, সেখানে প্রাচীনকালের প্রকৃত মসলিন হাতে ধরে দেখার সুযোগ হলো। ৭০০-৮০০ কাউন্টের ঢাকাই মসলিন সেসব।

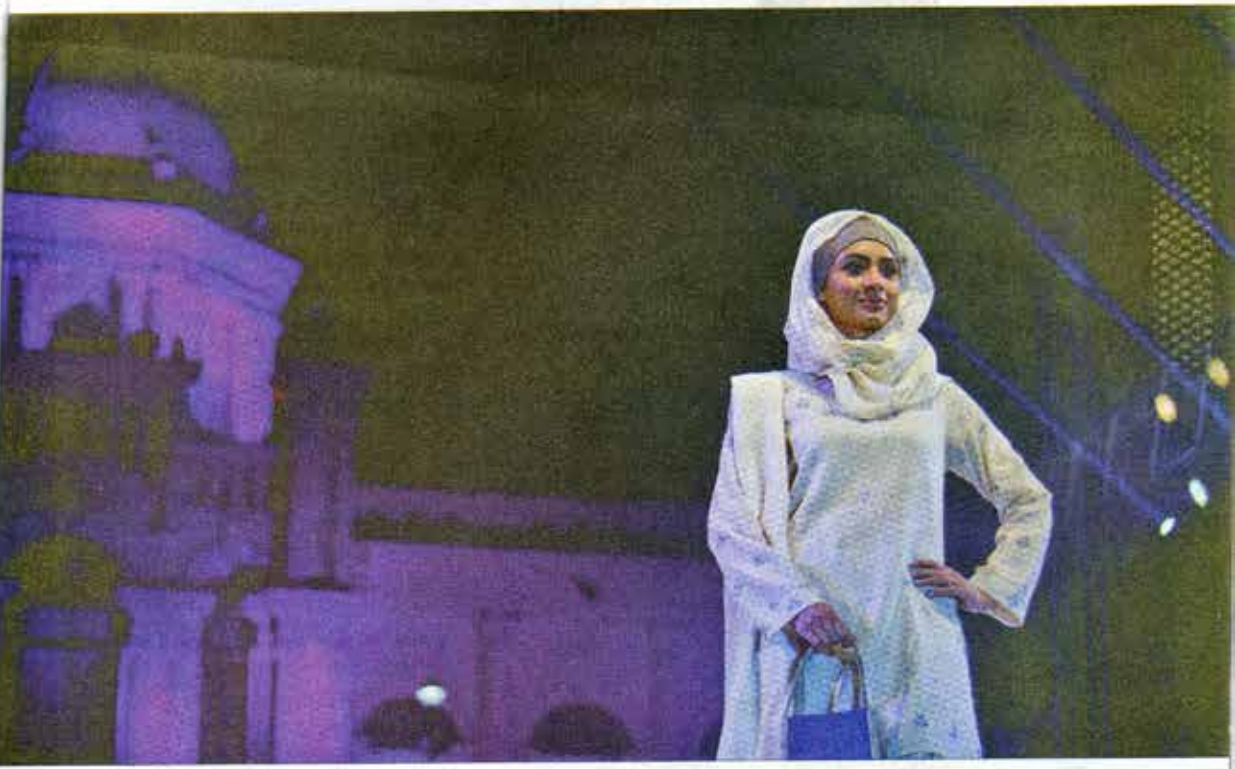

এখনকার পোশাকে আদি মসলিনের নকশা

অসাধারণ অভিজ্ঞতা! মসলিনের কাপড়গুলো যেন এ পৃথিবীর জিনিস নয়। এ যেন সুতা নয়, এ যেন আলো! এর আগে বিভিন্ন জাদুঘরে মসলিন কেবল কাচের বাইরে থেকে চোখে দেখেছি, ধরে দেখিনি।

ভারতের সুতা কাটুনিরা এখনকার তুলার ২০০-৩০০-৪০০-৫০০ কাউন্টের সূক্ষ্ম সুতা তৈরি করে এখন। বাংলাদেশে সেটা হয় না। কাউন্ট যত বেশি, সুতা তত সূক্ষ্ম। যা-ই হোক, ভারতে ওই তুলার সঙ্গে দিলাম আমাদের কিছু তুলা, যেগুলো বিভিন্ন গ্রাম থেকে আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। তুলা উন্নয়ন বোর্ডে যেগুলো চাষ হচ্ছিল। এগুলো মসলিনের তুলা নয়, আবার সাধারণ তুলার চেয়ে আলাদাও। তবুও সেগুলোকে কাটুনি করতে বলে দিলাম। যে সুতা তারা কাটল, দেশে ফিরে এলাম তা নিয়ে।

'স্বীকার করতে হয় ঢাকার "বোনা বাতাস" সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।'

—জন ফোর্বস ওয়াটসন
লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত কার্যালয়ের প্রতিবেদক, ১৮২১-১৮৯২

তাঁতিদের তৈরি করা

মসলিনের গবেষণার চেয়েও কষ্টকর ছিল তাঁতিদের এই কাপড় বুননের জন্য রাজি করানো। প্রথমে মসলিনের গল্প শুনে তারা খুব উৎসাহ দেখাল, কিন্তু সুতা দেখার পর বেঁকে বসল। এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তারা কখনোই কাজ করেনি। আমরা প্রথমে এনেছিলাম ২০০ ও ৩০০ কাউন্টের সুতা। এরা করে কেবল ৬০ কাউন্টের সুতার শাড়ি। তাঁতিরা বলল, এই সুতা তৈরির কাজ, যাকে 'পাইরি' করা বলে, সেটাই শেষ করা যাবে না। তাঁত পর্যন্তই নেওয়া যাবে না। তার আগেই ছিঁড়ে যাবে। এরপর আমি অনেকভাবে অনেক তাঁতির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মাত্র ৫-৬ জন টিকল। প্রত্যেকেই কিছুদিন পর ছেড়ে দেয়, আবার ধরে। এভাবে কয়েক মাস চলে গেল। ঠিক করলাম, এদের

এখনকার পোশাকে আদি মসলিনের নকশা। মডেল : ইশা

মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা, তাদের সব খরচ আমরা দেব। এটা করার পরে তারা চেষ্টা করছিল, কিন্তু হচ্ছিল না।

তারপর আমি আবার কিছু তথ্য পেলাম। মসলিনের সুতা নিয়ে ব্রিটিশ আমলে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছিল, সেই গবেষণায় তারা লিখে গেছে, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৈদ্যুতিক প্রভাব সুতার ওপর কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে। সেখান থেকে তথ্য নিয়ে আমরা আবার তাঁতিদের সঙ্গে বসলাম।

কিন্তু মাত্র একজন তাঁতি, আল আমিন, প্রচণ্ড ধৈর্য ও চেষ্টা দিয়ে লেগে রইলেন। তিনি ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁতের সূক্ষ্ম শানা নেই। শানার ভেতর দিয়ে সুতা কাপড় বোনার জন্য আসে। শানা যত সূক্ষ্ম হবে, কাপড়ও তত সূক্ষ্ম হবে। তারা ব্যবহার করে ১৪০০ মাত্রার শানা, কিন্তু আমরা জানি সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি হতো ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাত্রার শানা দিয়ে। সেই শানার খোঁজে নামলাম আবার। অনেক জায়গায় খুঁজে এক পরিবার পেলাম, যারা সূক্ষ্ম শানা তৈরি করে। আগে তারা বেদে ছিল। তারা প্রথমে বলল, যে বাঁশ দিয়ে এমন শানা করা যায়, তেমন বাঁশই পাওয়া যায় না আজকাল। অনেক খুঁজে সেই বাঁশ জোগাড় করা হলো। প্রথমে ১৮০০ মাত্রার শানা পর্যন্ত করা গেল, এটা করতে তেমন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। ২০০০ থেকে ঝামেলা শুরু হলো। ক্রমশ ২০০০-এ গেলাম। তারপর ২৫০০, শেষমেশ ২৮০০-তে পৌঁছাতে পেরেছি।

সেই শানা নিয়ে আবার আল আমিনের সঙ্গে বসলাম। তার ঘরের চাল পাল্টে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হলো। আর্দ্রতা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে, সে চেষ্টাও করা হলো। একসময় দেখা গেল, সুতা বুনতে গিয়ে যে সমস্যা হয়, তার কিছু কিছু আল আমিন নিজেও সমাধান করতে পারেন। তিনি বোনার কাজ আস্তে আস্তে করে যাচ্ছিলেন।

এর পাশাপাশি আমরা সরকারের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিয়েছি। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর খুব উৎসাহিত করলেন। তিনি জাতীয় জাদুঘরের সঙ্গে কাজ করার জন্য যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আরও বললেন, যদি মসলিন সম্পর্কে আমরা নতুন যা জানলাম, সেটা মানুষকে জানানো যায়, সঙ্গে মসলিন তৈরির পদ্ধতি যদি ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে একটি প্রদর্শনী হতে পারে। মসলিনের গল্পটা মানুষকে নতুন করে বলা গেলে, মানুষকে মসলিন সম্পর্কে জানাতে পারলে, দেখাতে পারলে খুব ভালো হবে। এরপর আড়ংয়ের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমাদের লক্ষ্য হয়ে গেল—জানা থেকে বলা ও করা। তখন বই প্রকাশ, মসলিন প্রদর্শনী, একটি সাংস্কৃতিক ও মসলিনভিত্তিক ফ্যাশন শো, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, কর্মশালা ও সেমিনার করার পরিকল্পনা নিলাম। এটা ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের কথা। সিদ্ধান্ত নিলাম, এই বছরের বাকি সময়ের মধ্যে

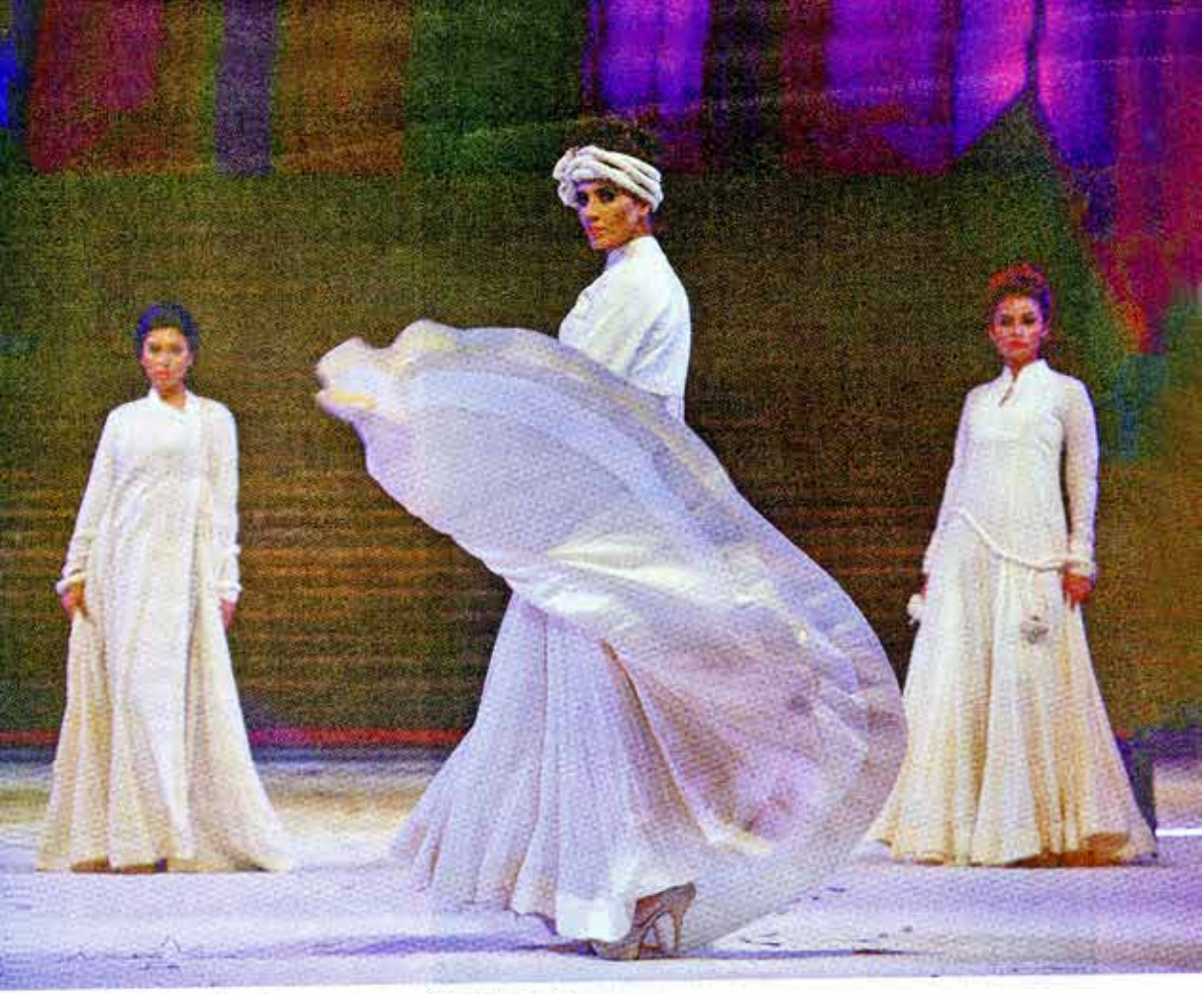

মসলিন নাইটে আদি মসলিনের নকশায় অনুপ্রাণিত পোশাকে মডেলরা

সবগুলো কাজ করে ফেলব।

'গাঙ্গেয় মসলিন, এ ধরনের উৎপাদিত বস্তুর মধ্যে সবার ওপরে।'

—ড. উইলিয়াম ভিনসেন্ট
পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি, ভলিউম ১, ১৮০০

মসলিন উৎসব ২০১৬ ও তারপর

২০১০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা মসলিন উৎসবের আয়োজন করলাম জাতীয় জাদুঘর ও আড়ংয়ের সহযোগিতায়। উৎসবে অনেক বিশেষজ্ঞ এলেন। বিশেষ করে বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা দুজন বিশেষজ্ঞ এলেন। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল ও রিসার্চ ফেলো সোনিয়া অ্যাশমোর। তাঁরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করলেন। এই জাদুঘরে প্রায় ৬০০-৭০০ মসলিনের কাপড় সংরক্ষিত আছে। ভারত থেকেও বিশেষজ্ঞ ও নমুনা আসার কথা ছিল। কিন্তু ভিসা জটিলতায় সেটা হলো না। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে এসেছেন। খুবই সফল একটি প্রদর্শনী হলো। এ সময় ঢাকা আর্ট সামিট হচ্ছিল, শিল্পকলা একাডেমিরও কিছু কাজ হচ্ছিল। প্রদর্শনী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ মসলিন নিয়ে আমাদের গল্পটা জানল। জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত মসলিন উৎসবের মাসব্যাপী প্রদর্শনীতে প্রায় এক লাখের বেশি মানুষ এল। এদের মধ্যে প্রায় ১৯০ জন বিদেশি কিউরেটর।

সরকারের কাছ থেকে আমরা অসাধারণ সহযোগিতা পেয়েছি। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় উৎসবের এক-তৃতীয়াংশ খরচ দিয়েছে। এ ছাড়া

মসলিন পরা লেডি জর্জিনা ক্যাভেন্ডিস, ডাচেস অব ডেভেনশায়ার (১৭৫৭-১৮০৬)। ছবি : ডেভেনশায়ার সংগ্রহ, যুক্তরাজ্য

সরকারের অন্যান্য বিভাগও সহযোগিতা করেছে, বিশেষত অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ব্র্যাকের আড়ংও এক-তৃতীয়াংশ খরচ দিয়েছে। বাকিটা হয়েছে দূকের অর্থায়নে।

উৎসবের পরে ব্যবসায়িক মহল থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। মসলিনকে বাজারে আনা, আরও জনপ্রিয় করতে যে খরচ লাগবে, সেটা করতে চান না অনেকে। আমি তাঁতিদের জন্য বিনিয়োগ করে তাঁদের দক্ষ করে তোলার ব্যাপারে জোর দিতে চাই। আমরা কিছু তাঁতির দক্ষতা তৈরি করছি, কিন্তু এখন তো সেটা ধরেও রাখতে হবে। এ জন্য যাঁরা বুনন নিয়ে কাজ করছেন, যাঁরা দেশীয় পোশাক, জামদানি ইত্যাদির ব্যবসা করছেন, তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার জন্য হলেও এতে বিনিয়োগ করা উচিত।

এ তো সুতা নয়, যেন আলো....'নতুন মসলিনের' সুতা

মসলিনকে বাজারে নিয়ে আসতে তাঁদের কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসায়িক হিসাবের বাইরে প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভেবে আমাদের দেশের একসময়ের দুনিয়া-কাঁপানো এই শিল্পকে ধরে রাখা দরকার।

ইতিমধ্যে সরকারের দিক থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দূক-বেঙ্গলের মসলিনের তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে আরও দ্রুতগতিতে, বিভিন্ন বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মসলিন বুননের কাজটা দ্রুত এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সায়েন্স ল্যাবরেটরি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে তুলার বিভিন্ন জাতের গবেষণার জন্য বাজেট বাড়ানো দরকার। তাঁতিপল্লিতেও নজর দেওয়া উচিত, যেন তারা আরও সূক্ষ্ম জামদানি তৈরি করতে পারে। ভারত কিন্তু এটা করছে। তারা ৩০০-৪০০ কাউন্টের কাপড় তৈরি করছে। আমরা যেন আমাদের তাঁতিদের সেভাবে দক্ষ করে তুলি। সে তুলনায় বলতে গেলে এখনো আমাদের সরকার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

আমরা কিন্তু উৎসাহ পেলাম বিলেতে এসে। যখন আমাদের গল্প নিয়ে ব্রিটেনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিউ গার্ডেনে ও এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম, বেশ সাড়া পেলাম। তারা আমাদের বই দেখে, প্রদর্শনী দেখে, রোজমেরি, সোনিয়াদের সঙ্গে কথা বলার পর সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আমাদের তথ্যগুলো দেখে নিশ্চিত হলো যে এগুলোর যথার্থতা আছে। তাই তারা সরাসরি মসলিন নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। অনতিবিলম্বে আমাদের সেটা করা উচিত।

'ভারতীয়রা সোনার কাজ করা উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের কাপড় পরত, কতগুলোতে ভরা ফুলের নকশা ছিল।'

—মেগাসথিনিস

গ্রিক ঐতিহাসিক, ভারতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারের প্রতিনিধি
খ্রিষ্টাব্দ ৩৫০-২৯০

আদি মসলিনের কাছাকাছি

মসলিনের আদি গাছের নাম ছিল ফুটি কার্পাস, বৈজ্ঞানিক নাম 'গসিপিয়াম

আরবোরিয়াম ভার নেগলেক্টা' (*Gossypium Arboreum Var Neglecta*)। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশরা কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বসিয়েছিল। যেমন ভারতের নাগপুরে সে দেশের সবচেয়ে বড় তুলা উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে এ ধরনের তুলারই প্রায় ১৯০০ প্রজাতি আছে। আমরা দুই জায়গা থেকে এই তুলার কতগুলো প্রজাতি আনলাম। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে যে বীজগুলো বেছে এনেছিলাম, সেগুলোর কিছু নিলাম। গবেষণার একপর্যায়ে এসে একটি প্রজাতিতে দেখা গেল, আদি মসলিনের কাছাকাছি একটি জাতের সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি। আদি মসলিনের গাছ ফুটি কার্পাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এক. সাধারণ তুলাগাছে পাতার আঙুল তিনটি, ফুটি কার্পাসের পাঁচটি। দুই. গাছের কাণ্ড লালচে হয়। তিন. গাছের উচ্চতা সাধারণ তুলাগাছের মতো নয়, একটু কম। চার. তুলা খুব বেশি হয় না ও পুরো ফুটে যাওয়ার পর নিচের দিকে মুখ করে থাকে (এখনকার বেশির ভাগ তুলা সাধারণত ওপরের দিকে মুখ করে থাকে), ফলে মসলিনের তুলা বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। পাঁচ. বছরে দুবার ফসল দেয় এ তুলাগাছ। এসব বৈশিষ্ট্যের খুব কাছাকাছি মিলে গেল আমাদের নতুন গাছের জাতটা।

মডেল : রিবা

আমাদের মাথায় ছিল, তুলা উন্নয়ন বোর্ডে গাছগুলো লাগালে সেখান থেকে ফল না-ও আসতে পারে। কারণ ফুটি কার্পাস লাগানো হতো মেঘনা, শীতলক্ষ্যা নদীর ধারে। আর মসলিন সুতা দিয়ে কাপড় বোনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই নতুন জাতের ফুটি কার্পাসের তিন ধরনের প্রজাতির চারা আমরা শীতলক্ষ্যা নদীর ধারের জমিতে লাগালাম। ঠিক প্রাচীনকালে যে পদ্ধতিতে মসলিনের চাষ হতো, সেভাবে। আমাদের মাথায় এও ছিল, প্রায় ২০০ বছর আগে যখন মসলিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তখনকার পরিবেশ এখন তো আর নেই। তাই একেবারে আদি মসলিনের তুলা ফিরে পাওয়া হয়তো কখনোই যাবে না। কিন্তু তার কাছাকাছি তো আমরা যেতে পারি।

মসলিনের তুলা চাষের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাকৃতিকভাবে তুলার চাষ হলো। সেখান থেকে তুলা ও পাতা নিয়ে আমরা আবার বিলেতে চলে এলাম ডিএনএ বিশ্লেষণের জন্য। এখানে কিউ গার্ডেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও দুক-বেঙ্গল মসলিনের যৌথ উদ্যোগে মসলিন নিয়ে নতুন পর্যায়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে এটি। গসিপিয়াম আরবোরিয়াম ভার নেগলেক্টার নামে

মসলিন তৈরির বিভিন্ন যন্ত্র

নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোশেফিনের শোয়ারঘর। তাঁর বিছানার চারপাশে চাঁদোয়া নকশাদার মসলিন

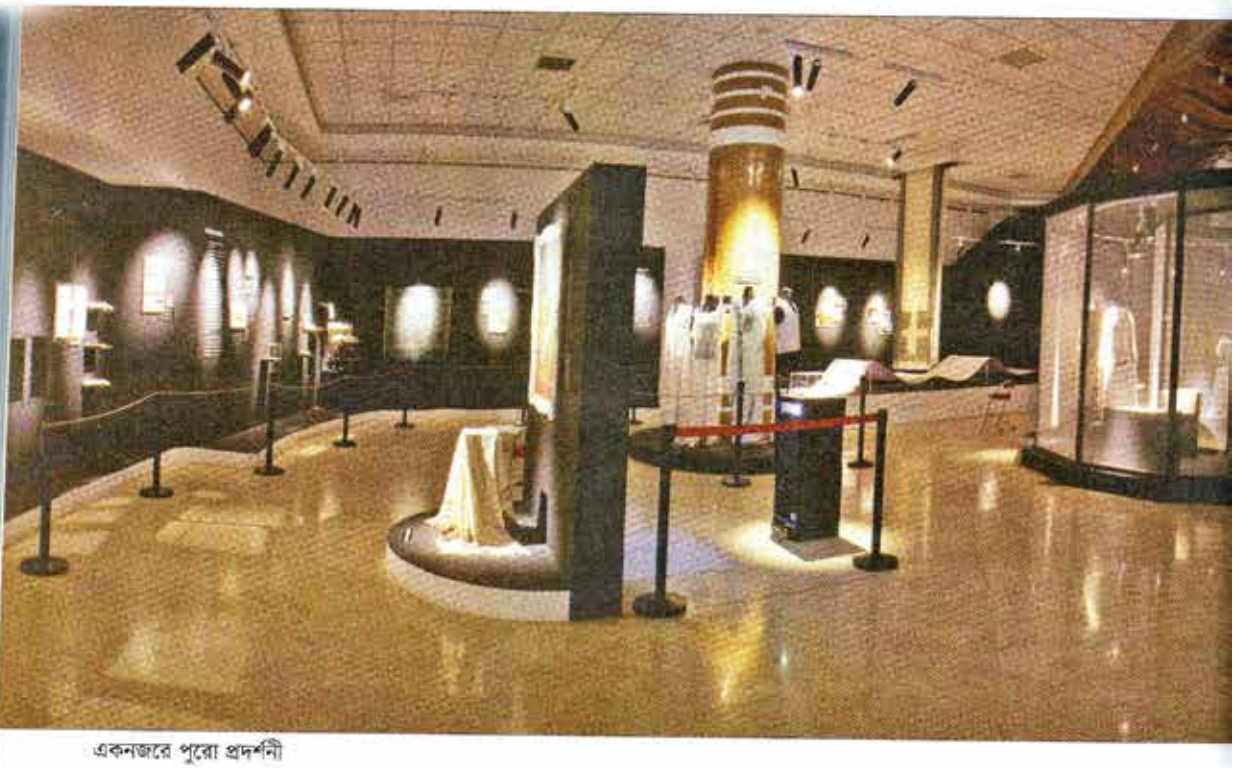

একনজরে পুরো প্রদর্শনী

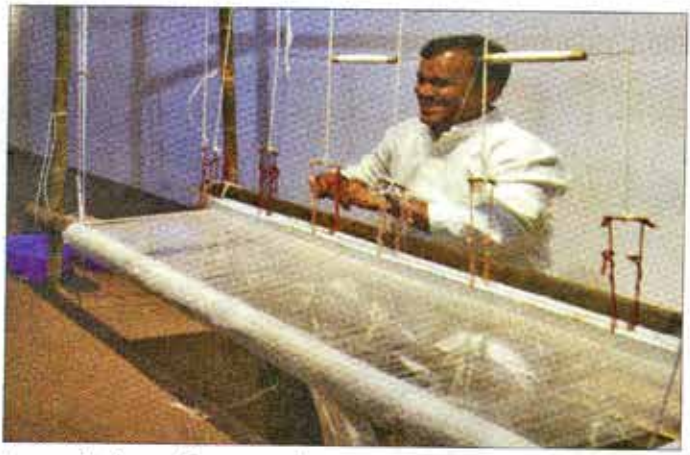

'নতুন মসলিন'-এর কারিগর আল আমিন

কিউ গার্ডেনে মসলিনের তুলার কয়েকটি ধারা আছে। সেগুলোর ভিএনএর সঙ্গে আদি মসলিনের কাছাকাছি নতুন যে তুলা পেয়েছি আমরা, তার নমুনার তুলনা করা হচ্ছে এখন। একেবারে কোষের পারমাণবিক পর্যায় থেকে—ফাইবার লেংথ, ফাইবার টুইস্ট, ফাইবার স্ট্রেংথ কী রকম, সেগুলো দেখা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির একজন নামকরা অধ্যাপকের অধীনে পুরো কাজটি শুরু হয় ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অনিবার্য কারণে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপকের নাম প্রকাশ করছি না। মে মাসে প্রথম পরীক্ষার ফলাফলে আমরা দেখলাম, দুই তুলার মধ্যে মিল আছে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। এই পরীক্ষাটা আরও কয়েকবার হবে। এটিই গবেষণার প্রথম পর্যায়।

বাংলাদেশ গসিপিয়াম আরবোরিয়ামের আরও প্রায় ৯-১০টি প্রজাতি আছে। সেগুলোর সব নিয়ে গভীরভাবে এই গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় আমরা শুরু করব। এ পর্যায়ে কিউ গার্ডেন থেকে সংগৃহীত ৯-১০টি নমুনা, কলকাতা থেকে সংগৃহীত ৫-৬টি প্রাচীন নমুনা এবং বাংলাদেশের তুলার ধরনগুলো পরীক্ষা করে দেখা হবে। এটা আগামী আগস্ট নাগাদ শুরু হবে। এ ব্যাপারে যে অর্থ লাগছে, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ই দিচ্ছে। কিউ গার্ডেন সহায়তা করছে। দৃক তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে। বাংলাদেশের তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রাখছি। আমরা চাইছি, আমাদের মসলিনের যে গল্প, সেটা যেন একটি বাস্তব রূপ পায়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায়। ঠিক যেমন আমাদের তাঁতিরা আদি মসলিন না হলেও, বুননের দিক থেকে মসলিনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তেমনি গাছটাও যেন আদি ফুটি কার্পাসের কাছাকাছি চলে যেতে পারে, আমরা সে চেষ্টাই করছি।

তা ছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও আমাদের বইটি নিয়ে নানা আলোচনা ও কথাবার্তা চলছে। আমরা আমাদের বানানো মসলিনকে বলছি 'নতুন মসলিন'। আমরা আগের তুলা থেকেই ভারতে সূক্ষ্ম সুতা বানাচ্ছি। উৎসবে আমরা ২০০ ও ৩০০ কাউন্টের দুটি মসলিন শাড়ি উপস্থাপন করেছিলাম। এরপর ২৫০ ও ৩০০ কাউন্টের আরও কিছু মসলিন বানিয়েছি। সবশেষ বানিয়েছি ৩৫০ কাউন্টের মসলিন শাড়ি। সেটি চলে গেছে বছরব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীটি হচ্ছে

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের হুইটওর্থ গ্যালারিতে। শুরু হয় ২০১৭ সালের ২০ মে, শেষ হবে ২০১৮ সালে ৩ জুন। সঙ্গে থাকছে মসলিন নিয়ে বাংলাদেশের গল্পটি, বই ও আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি বিবরণ। আমাদের পরিকল্পনায় আরও অনেক কিছু করার আছে এ নিয়ে। আমাদের এই পুরো মসলিন যাত্রা নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ শেষ হয়েছে। এটাকেও বিভিন্ন জায়গায় দেখাতে চাই।

এখন আমরা নতুন মসলিনের তুলা থেকে সুতা কাটুনির পর্যায়ে চলে যেতে চাই। নদীর ধারে ছোট আকারে প্রাকৃতিকভাবে তুলা চাষের চেষ্টা করছি। যদি ইতিবাচক কিছু পাই, তাহলে আমরা আরও বড় আকারে চাষের কথা ভাবব। প্রচুর পরিমাণে তুলা আমাদের প্রয়োজন হবে, যদি এটা থেকে কিছু বানানোর কথা ভাবি। শেষমেশ কী হবে, আশা করি, সেটা নির্ভর করবে সরকারি ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ওপর।

আমরা জোর দিচ্ছি তাঁতিদের দক্ষতা তৈরিতেও। তাঁদের হাত পাকা না করলে মসলিনের কাছাকাছি তুলা পাওয়া গেলেও কোনো লাভ হবে না। মসলিন উৎসবের জন্য মাত্র একজন তাঁতি, আল আমিন ২০০ ও ৩০০ কাউন্টের দুটি শাড়ি তৈরি করেছিলেন। তিনি সর্বশেষ ৩৫০ কাউন্টের শাড়িটি করেছেন। এখন ২০০ কাউন্টের শাড়ি বুনতে পারেন, এমন আরও ৬ জন তাঁতি আছেন। আল আমিনকে দেখে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন।

মসলিনের জিআই-স্বত্ব (জিওগ্রাফিকাল ইনডিকেশন) দাবিও আমাদের মাথায় আছে। এ ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। খুবই খুশির খবর, ক্র্যাফটস কাউন্সিলের উদ্যোগে ভারতের সঙ্গে অনেক লড়াই করে জামদানির জিআই-স্বত্ব ইউনেসকো থেকে বাংলাদেশ পেয়েছে। সরকার প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনও করেছে। আরও ভিন্ন জিনিস নিয়ে সরকার চিন্তা করছে, এটা আশাব্যঞ্জক। মসলিন নিয়ে জানামতে এখনো কেউ আবেদন করেনি। তবে কোনো আবেদন করতে হলে আগে

আদি মসলিনের নকশায় অনুপ্রাণিত পোশাকে মডেল ইন্দ্রানী

দেখাতে হবে যে বর্তমানে এটার বুনন হচ্ছে। দেখাতে হবে, এটি একটি জীবিত কারুশিল্প। আমাদের কাছে যে পরিমাণ তথ্য আছে, তারপরে এখন মসলিন যদি নিয়মিত উৎপাদনব্যবস্থার ভেতরে চলে আসতে পারে, তাহলে এর জিআই দাবি করা যাবে।

সব যাত্রার শুরু আছে, আবার শেষও আছে। মসলিন ফিরে পাওয়ার পথে অনেক ঘোরপ্যাঁচ থাকলেও আমাদের উদ্দেশ্য অবিচল ছিল। আমরা চেয়েছি, ঔপনিবেশিক ধারাবিবরণী থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের মহৎ কারুশিল্পীদের দক্ষতার গাথা প্রচার করতে। প্রথম পর্যায়ে আমরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি মসলিনের সঙ্গে আমাদের দেশ, মানুষ আর মাটির সম্পর্ককে। এরপর আমরা চাই যুগযুগান্তরের সাফল্য একত্র করে মসলিনের পুরোনো ও নতুন নমুনাসহ এর কাহিনি দেশের ভেতরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করতে ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য ত্রিমুখী। এক. এই কিংবদন্তির কাহিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ও আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া (সে কারণেই আমরা শিশুদের জন্য গ্রাফিক বই প্রকাশ করেছি। শিশু একাডেমির কাছে আবেদন করেছি বইটি বিতরণের জন্য)। দুই. মসলিনের তুলাগাছের বিশেষত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করে বাংলার নদীর ধারে মসলিন তুলার চাষ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো। তিন. আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশে তাঁত বুননের মাত্রা বাড়িয়ে ৪০০-৫০০ কাউন্টের শাড়ি বোনা।

আমাদের কাছে মসলিন-সম্পর্কিত যেসব ঐতিহাসিক তথ্য আছে, সেগুলো জাতীয় জাদুঘরকে দিয়ে দিতে চাই। তবে তার জন্য যথাযথ জায়গা ও একজন পৃষ্ঠপোষক লাগবে। এরপর আমরা মনে করব, আমাদের যাত্রা সফলভাবে শেষ হয়েছে। তখন দৃক আবার নতুন কাজে জড়িত হবে। মসলিনের মশাল হস্তান্তর হবে।

এই পর্যায়ের যাত্রায় জিআই নিবন্ধনকরণ, মসলিনের বাণিজ্যিক উৎপাদন আর নতুন গবেষণার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে এবং দেশের কারুশিল্প সংস্থাগুলোকে। দৃকে ধারণকৃত সব জ্ঞানভান্ডার, পদ্ধতিবিদ্যা এবং সহায়তা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মোচিত থাকবে।

'উপমহাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বোনা কাপড় মসলিন।'

—আবুল হাসান ইয়ামিন-উদ-দিন খুসরাও
চতুর্দশ শতকের ভারতীয় সুফি কবি ও পণ্ডিত, ১২৫৩-১৩২৫

শেষ কথা

মসলিন হারিয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা সেটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের এমন অনেক সম্পদ আমাদের এখনো আছে, যেগুলো হারিয়ে

নতুন মসলিনের অভিযাত্রীকেরা, মসলিন অনুসন্ধানী দল

যাচ্ছে। একবার হারিয়ে গেলে সেটাকে ফিরিয়ে আনা যে কত কষ্টের কাজ, সেটা মসলিন দিয়েই আমরা বুঝতে পারি। তাই বিলুপ্তপ্রায় সম্পদগুলো সংরক্ষণ করা, ধরে রাখার জোরদার চেষ্টা করা দরকার এখন। আমাদের জিডিপি ৭ বা ৮ ভাগ, এর ভেতরে কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ব্যাপারগুলো নেই। আমাদের তৈরি পোশাক কারখানা অনেক টাকা আয় করছে, এটা কিন্তু বিশ্বে আমাদের কোনো পরিচয় তৈরি করছে না। আমরা আমাদের জাতীয় পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-জসীমউদ্‌দীন-জয়নুল-কামরুল থেকে, আমাদের নাটক থেকে, জামদানি থেকে। এ ব্যাপারগুলোকে, যেগুলোকে ইউনেসকো বলে ইনট্যানজিবল হেরিটেজ, এর মূল্য সবাই মিলে ধরে রাখা উচিত।

বিদেশে এমন অনেক জাদুঘর আছে, যার উদ্যোক্তা ছিলেন বড় বড় ব্যবসায়ী। ব্যবসার বাইরে তাঁরা জাদুঘরগুলো করেছেন। আমাদের দেশে তৈরি পোশাক কারখানার সমিতিগুলোয় যাঁরা আছেন, তাঁরা হাতের এই কারুশিল্পকে কেন যেন আধুনিক ভাবেন না। এখানে যেহেতু যন্ত্রের ব্যাপার নেই, তাই যেন এটা প্রযুক্তি নয়, মূল্যবান নয়। কিন্তু দুটোকে মিলিয়ে একটা কিছু করা, পুরোনো ঐতিহ্যের নতুন ব্যবহার, এটা এখনো হচ্ছে না। বাইরের দেশগুলোতে মানুষ নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করে, মসলিনের মতো তাদের এমন ঐতিহ্যকে কীভাবে দুনিয়ার কাছে তুলে ধরে, আমরা দেখেছি। একটি উন্নত জাতি নির্মাণের পথে আমরা যেহেতু আছি, সে ক্ষেত্রে আমাদেরও আত্মপরিচয় নির্মাণ করার সময় এসে গেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, মসলিন শুধু কিংবদন্তির কাপড় নয়, এটা কিংবদন্তি সৃষ্টিকারী বাংলাদেশের মানুষের প্রতীক। ●